# রবীন্দ্রনাথের গান রচনার আখ্যান

সুধীর চক্রবর্তী



এমন একটা বিষয়ে বলা হবে, রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে, যে বিষয়ে শোনার জন্য মানুষকে প্রস্তুত হতে হয়, অধিকারী হতে হয়। সেই ভরসাতেই দু'চারটি কথা বলা। আমার বিষয় 'রবীন্দ্রনাথের গান রচনার আখ্যান'। আমি ইচ্ছে করেই গল্প কথাটি ব্যবহার করি নি। গল্পকথার মধ্যে কোথায় একটা কী লঘুতা আছে, যে কতগুলি যেন গাল - গল্প চলছে এমন লোক ভাবতেও পারে। এই আখ্যান কথাটাএকটু বোঝাবার জন্য প্রথমেই বলা উচিত--- পৃথিবীর সঙ্গীতের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা কাজ করেছেন প্রত্যেকই সঙ্গীতের এবং সঙ্গীত রচনার সামাজিক প্রেক্ষাপট নিয়ে যাঁরা ভেবেছেন, তাঁদের বই পড়লে দেখা যায় যে বিশেষ কিছু কিছু গান রচনার, বিশেষ কিছু কিছু সঙ্গীত রচনার প্লব্ত্ব্দনন্তু যাকে বলে,ন্দ্বব্দব্দ্ধন্দ্বব্জ্ঞ প্লব্ত্ব্দনন্তু যন্ত্র সহযোগে পরিবেশিত হয়, সেইসব রচনার নানারকম উপলক্ষ আছে। কতগুলো অদ্ভুত সংগঠন আছে, কতগুলো কাকতালআছে। বিস্ময়করভাবে পৃথিবীর অত্যাশর্চ্য কিছু গান রচিত হয়েছে। বেশকিছুদিন আগে পর্যন্ত আমরা গানকে শুধু বিনোদন মনেকরতাম। কিন্তু পরবর্তী সময়ে গানের সামাজিক পটভূমিকা, গানের পেছনে ব্যক্তি মনের করতাম। কিন্তু পরবর্তী সময়ে গানের সামাজিক পটভূমিকা, গানের পেছনে ব্যক্তি গীতিকারের আর্তি, ব্যক্তি গীতিকারের আনন্দ দুঃখ বেদনা এগুলো জুড়ে যায় আস্তে আস্তে। গানকে তখন আর বিনোদনের সামগ্রী বলে মনে হয় না, মনে হয় আমাদেরই সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল শস্য। মনে হয় গানের পেছনে রয়েছেন একজন মরমী ব্যক্তি। তিনি অন্তহীনভাবে গানের বেদনার মধ্যে দিয়ে তঁার নিজের জীবনকে আমাদের কাছে কেবলই মেলে ধরেছেন। আমরা কি ধরতে পারছি সেসব কথা?

রবীন্দ্রনাথ যতদিন বেঁচে ছিলেন তাঁর গান সম্পর্কে সত্যিকারের অভিনিবেশ, সত্যিকারের বিশ্লেষণ, তাঁর গানকে তেমন করে বোঝার দায়িত্ব বঙ্গবাসী যে নিয়েছিলেন এমন মনে হয় না। হয়তো কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, নোবেলজয়ী রবীন্দ্রনাথকেপ্রচণ্ড অভিভবে তাঁর গানগুলোকে তেমন করে সেসময় বিচার করা যায়নি। গানগুলোকে গাওয়াও হয়নি তেমন করে। তাঁর মনে একটা ক্ষোভও ছিল। আমাদের ছোটবেলায় বেশ মনে করতে পারি, রবীন্দ্রনাথের গান ব্যাপারটা খানিকটা শান্তিনিকেতনী ব্যাপার, খানিকটা ব্রাহ্মদের ব্যাপার,এরকম জাতীয় বিশেষণ যে কানে যায় নি তা নয়। রবীন্দ্রনাথের গানের আজকে যে 'ভুবন জোড়া আসনখানি' সেটা আমাদের সামনেই পাতা হল ধীরে ধীরে। নিজের জীবনে আমরা দেখলাম যে একটা সামান্য জায়গা থেকে শু করে রবীন্দ্রনাথের গান কী অসামান্য ভূমিকায় চলে গেল। সমস্ত দেশকে জাতিকে পরিপ্লাবিত করে একটা আধুনিক সংস্কৃতির মূল্যমান তৈরি করে গানকে এমন একটা গরিষ্ঠ ভূমিকায় তিনি দাঁড় করিয়ে দিলেন নিজের অলক্ষে, নিজে না থেকে, নিজে না গেয়ে শুধু 'এই কথাটি মনে রেখো আমি যে গান গেয়েছি'। সত্যিই আমরা মনে রেখেছি। কী যে বিপুল গান গেয়েছিলেন, কতরকম করে যে গেয়েছিলেন সেই গান তাঁর জীবিতকালে আমরা তাঁকে প্রত্যর্পণ করতে পারিনি। মৃত্যুর পর ঝর্ণাতলার নির্জনে তাঁর গানের কলস ভরে উঠল আমাদের উচ্ছ্বসিত উচ্চারণে।

রবীন্দ্রনাথের গান রচনার ইতিহাস সুদীর্ঘ, তাঁর জীবনের দুটি অংশকে ভাগ করব। একটা অংশকে গান গাওয়ার ইতিহাস, একটাকে বলবগান রচনার ইতিহাস। গায়ক রবীন্দ্রনাথ এবং দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ।

গায়ক রবীন্দ্রনাথের কথা সবাই শুনেছেন। 'কবে যে গান গাইতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না।' একেবারে শিশুকাল থেকে গান গাইতেন। এবং জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও গান গাইছেন। আশি বছর জীবনপরিক্রমায় গানই যে তাঁকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গান দিয়ে একের পর এক দরজা খুলে যাচ্ছেন, জীবনের চেতনার সমস্তরকমের উন্মীলনের। কী অত্যাশর্চ্য ব্যক্তিত্ব, কী অপরূপতার উন্মোচন। "গানে গানে নিজের আত্মজীবনটাকে লিখে গেলেম, তোমরা আমার সব কিছু ভুলে য াবে, আমার কবিতা আমার উপন্যাস, নাটক, এসবের হয়তো মূল্য থাকবে না, কিন্তু আমার গান তোমাদের গাইতেই হবে।" তাঁর সেই অনুজ্ঞা আমরা পালন করেছি। গাইতেই তো হচ্ছে। তাঁর গানের পর আর নতুন গান তেমন করে অ ামরা তৈরি করতে পারিনি। কিন্তু আমাদের মনে হয় বাংলা গানের ইতিহাস শুধু নয়, ঋিগানের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখব, কী চমকপ্রদভাবে কতগুলো গান তৈরি হয়েছে।

প্রথমেই আমি কয়েকটি গান রচনার কথা বলি, যা রবীন্দ্রনাথের নয়। সেটা না বললে রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাবে না। পরিপ্রেক্ষিতকে তৈরি না করলে তো কখনো কোনও জিনিসকে দাঁড় করান যায় না। প্রথমে দ্বিজেন্দ্রলালের কথা বলি। দ্বিজেন্দ্রলালের দুটি গান রচনার কথা বলব। যখন তিনি সুজামুঠা পরগণায় হাকিমি করতেন, আমলা ছিলেন, সক ালবেলা উঠে সাহেবি পোশাক পরে, হ্যাটকোট পরে চাকরি করতে যেতেন। তাঁর বাড়িটা সুজামুঠা পরগণায় যেখানে ছিল, একটা বকুল গাছ ছিল, সুন্দর একটা উঠোন ছিল, সুন্দর একটা বাগান ছিল। সেখানে তাঁর স্ত্রী সুরবালা দেবীর বয়স এগার এবং সে সময় যখন স্বামী চলে গেছেন কাজে, সারাদিন একাএকা কিশোরী মেয়েটি করে কী! একটা একটা বকুল ফুল কুড়িয়ে সারাদিনে ধৈর্যে তিতিক্ষায় ভালোবাসায় একটা একটা কে সুতো দিয়ে বেঁধে বকুল মালাতৈরি করে রেখেছেন স্বামীকে চমকে দেবেন বলে। কার্যান্তরে সমস্ত শেষ করে ফিটনগাড়ি করে দ্বিজেন্দ্রলাল ফিরলেন। একজন হাকিম মানুষ, তখন তাঁর ভিতর থেকে সেইস্রষ্টা গীতিকার বেরিয়ে আসেন নি! এসে যখন বাড়ি মধ্যে ঢুকেছেন, দরজার অন্তরাল থেকে লুকনো কিশোরী বধূ ছুটে এসে তাঁর গলায় সেই নতুন তৈরি করা মালাটি বকুল ফুলে গাঁথা, তাঁর গলায় ঝুলিয়ে দিলেন। কী আনন্দ! এবং নতুন প্রেমিক সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় বাড়ির মধ্যে গিয়ে যে অসামান্য গানটি রচনা করেছিলেনসেটা তঁ ার কথা নয়, "আমি সারা সকালটি বসে বসে / আমার সাধের মালাটি গেঁথেছি। / আমি পরাব বলিয়া গলায় তোমার মালাটি এ মালাটি তোমায় গেঁথেছি।/ সারা সকালটি বসে বসে / আমি সারা সকালটি করি নাই কিছু / করি নাই কিছু বঁধুয়া শুধু বকুলের তলে বসিয়া বিরলে মালাটি তোমায় গেঁথেছি/ সারা সকালটি বসে।" এই অসামান্য গানটি নাটকে প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু এর রচনার আখ্যানটুকু যদি মনে থাকে তার সূত্রে মনে থাকবে একটি নবীন প্রেমের অত্যাশর্চ্য প্রেমস্নিগ্ধ স্মৃতি। যা চিরকালের সুতোয় গাঁথা হয়েগেল একটি একটি বকুল ফুলকে দিয়ে। একটি অসামান্য গানের ইতিহাস।

এই একই মানুষ দ্বিজেন্দ্রলাল দেবকুমার রায়চৌধুরী তাঁর জীবনীগ্রন্থের মধ্যে লিখেছেন, একদিন খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। বিশ্রাম করছেন, গল্প করছেন। হঠাৎ বললেন শোন, আমি পাশের ঘর থেকে গিয়ে সেটাকে মুক্ত করে আসি। গেলেন। গিয়ে আধঘন্টার মধ্যেই ফিরেএলেন। ফিরে এসেই "বঙ্গ আমার জননী আমার" ...সেই গানটি তাঁকে এতক্ষণ ভীষণ চঞ্চল করেছে, সেই দেশপ্রেমিক সত্তা ভিতরে ভয়ঙ্কর উদ্দীপনা, গানটিকে কিছুতেই বার করতে পারছিলেন না। প াশের ঘরে গিয়ে একটু একটু করে গানটার মোক্ষণ ঘটল। তারপরের বর্ণনা দেবকুমার দিয়েছেন, কীসের দুঃখ কীসের দৈন্য কীসের লজ্জা কীসের দ্বেষ ...এটা গাইতে গাইতে দ্বিজেন্দ্রলাল এবার নাচতে আরম্ভকরলেন এবং এই গান সম্পর্কে শেষপর্যন্ত বলা হয়েছে, যে এই গানই দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর কারণ অনেকটা। তাঁর সন্ন্যাস রোগ হয়েছিল। পঞ্চাশ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন। স্বদেশপ্রেমিক মানুষটি' যখন গানটি গাইতেন তখন নিজেকে আর রক্ষা করতে পারতেন না। প াগলের মতো গাইতেন। সমস্ত রক্ত মাথায় উঠে আসত। সবাই তাঁকে থামাবার চেষ্টা করত, কিন্তু তাঁকে থামানো যেত না। এই একটা অত্যাশর্চ্য গান বা দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশীবিপ্লবী, সবকিছুর সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের 'বঙ্গ আমার জননী আমার' চিরকালের বাংলা গান। যদি দশটাশ্রেষ্ঠবাংলা গানের তালিকা করতে বলা হয়, এই গানকে আমরা কোনদিন ছাড়তেপ ারব না। কী অদ্ভুতভাবে সে গান লেখা হয়েছিল। একদিন দুপুরবেলা হঠাৎ।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে, রজনীকান্ত সেন একটা ছোট্ট কাগজে একটা গান লিখে রেখেছিলেন এবং সেটা পড়েই গিয়েছিল, টেবিলে ছিল না। হাওয়ায় উড়ে পড়ে গিয়েছিল। তাঁর স্ত্রী সেই কাগজটি ঘর ঝাঁট দিতে দিতে পেলেন। পেয়ে সেটা পড়লেন। তাতে লেখা আছে 'কবে তৃষিত এ ম ছাড়িয়া যাইব/ তোমার রসাল নন্দনে।' সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্ত্রী কাঁদতে কঁ

াদতে এসে বললেন  'কথা দাও এইগান তুমি কোনদিনও আর গাইবে না। কেন তুমি এমন গান লিখেছ?' রজনীকান্ত বললেন 'কথা দিলাম তোমাকে যে এইগান আমিগাইব না।' পরে যখন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা এলেন, তাঁদের বললেন 'শোনো, আমি যখন মারা যাবো আমাকে পার করে দিও এ গানটা গাইতে গাইতে, এটিইআমার গান।' মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে। চুয়াল্লিশ বছর বয়সে অতিরিক্ত কণ্ঠ ব্যবহারের জন্য, অতিরিক্ত গান করার জন্য তার কর্কট রোগ হয়। অবশ্য তার জন্য নিশ্চয়ই না কর্কট রোগে তাঁর সমস্ত গলা থেকে সুর চলে গিয়েছিল। কথাবলার ক্ষমতা চলে গিয়েছিল। মেডিক্যাল কলেজের কটেজে তিনি ছিলেন, তাঁর গলায় অস্ত্রোপচার হয়। চিরকালের মতো বাক্‌দ্ধ হয়ে যান তিনি। এবং তখন তাঁর ছেলেদের বলতেন, নিজে অর্গ্যান বাজাতেন, ছেলেদের বলতেন ওই গানটা গা। ছেলেরা ওই গ ানটাই গাইত।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল যে, রবীন্দ্রনাথ একদিন শৈলজারঞ্জন মজুমদারকে ডেকে পাঠালেন। পাঠিয়ে বললেন, 'ডাকঘর' -এর যে মহড়া হচ্ছে, এই মহড়ায় একটা গান লিখেছি, গানটি এখুনি তুমি তুলে নাও। শৈলেনবাবু লিখলেন  গুদেব কখনোই কিন্তু দুপুরবেলা আমাকে ডাকতেন না। সেদিন হঠাৎ ডাকলেন। ডেকে বললেন, গানটা শিখে নাও তো। সেই গ ানটা হচ্ছে  সমুখে শান্তি পারাবার ভাসাও তরণী হে কর্ণধার। তারপরেই বললেন এই গানটা কিন্তু তুমি গেও না। এই গ ানটা কাউকে শিখিও না। এই গানটার তুমি কোনওস্বরলিপি কর না। এই গানটায় আজ হঠাৎ দুপুর বেলায় দেখতে পেল াম সমস্ত জীবনটাকে। মনে হল, এই গানটাই আমার শেষ গান। তোমার কাছে রইল গানটা। ভুলত্রমে চারপাঁচটা গানের সঙ্গে উনি সেটা কলকাতার পত্রিকায় স্বরলিপি করে পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে খবর আসতেই রবীন্দ্রনাথ বললেন  তুমি শিগ্‌গির এ স্বরলিপিটা প্রত্যাহার কর। ওই গান যেন মানুষের কাছে গিয়ে না পৌঁছায়। এটা আমার মৃত্যুঘটিত গান। আমার জীবনের একটা উপলব্ধি। একটা অদ্ভুত সময়ে আমি গানটা তৈরি করেছি। এই গানটাকে তুমি স াধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিও না। একমাত্র আমার মৃত্যুর পর পৌঁছে দিও। আমরা সেই গান এখন গাই। মৃত্যুকে উপলক্ষ করেই গাই। কিন্তু তখন আমাদের মনে থাকে না এক নিঃসঙ্গ মধ্যাহ্নে আকস্মিকভাবে তিনি জীবনের একটা অপূর্ব রূপ দেখে 'সমুখে শান্তি পারাবার' গানটি লিখেছিলেন। এরকম হয়।

অতুলপ্রসাদের জীবনেও হয়েছিল। রজনীকান্তের জীবনেও হয়েছিল। রজনীকান্তের সম্পর্কে একটা কথা মনে পড়ে গেল। একদিন রাজশাহীতে একটা সাহিত্য সভা হবে। উনি রওনা হচ্ছেন। ওঁর এক ঘনিষ্ঠ শুভার্থী ওঁকে বললেন, রজনী সভায় য াচ্ছ একটা গান নিয়ে যাবে না। তার উত্তরে জলধর সেন বলছেন, এরকম বললে কি গান লেখা যায় না কি? তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ লেখা যায়বইকী। অক্ষয়কুমার মৈত্র সেই ভদ্রলোক। বললেন ও ইচ্ছে করলেই গান লিখতে পারে। রজনী প াশের ঘরে গেলেন। খানিক্ষণ পরেই বললেন গানটা লিখে ফেলেছি। 'তব চরণ নিম্নে উৎসবময়ী শ্যামধরণী... কী অত্যশ্চর্য গান কী অনায়াসে লিখেছেন। কিন্তু ওই যে বলা - তুমি সভায় যাচ্ছ একটা গান নিয়ে যাবে না। এই এইটুকুই দরকার অ াছে, প্রত্যেক শিল্পীর জীবনে। আমাদের বাংলা গানের যাঁরা গীতিকার তার মধ্যে অতুলপ্রসাদ সেনের গানের সংখ্যা সবচেয়ে কম। মাত্র ২০৮ খানা। এত বড় ব্যাপ্ত জীবন, তেষট্টি বছরের। ২০৮ খানা গান কেন? তার কারণ হচ্ছে লক্ষ্ণৌতে একটা আলাদা বাড়িতে থাকেন - 'তুমিও একাকী, আমিও একাকী, ---এই বোধ নিয়ে দুজনে বাস করছেন। কিছুতেই গান লেখা হয় না। গান লিখিয়ে দেখাব, কতরকমভাবে তাঁকে দিয়ে গান লেখানো হয়েছে। কে অতুলপ্রসাদকে দিয়ে গান লেখ াবে? পাশে স্ত্রী নেই। সুন্দরসুস্থিত কোনও জীবন নেই। হঠাৎ হঠাৎ স্ত্রী আসতেন। যখন আসতেন তখন অতুলপ্রসাদ উচ্ছসিত হয়ে গেয়ে উঠতেন ---'আজ আমার শূন্য ঘরে আসিল সুন্দর, ওগো অনেকদিনের পর।' গানের বাণী অ াত্মজীবনীর প্রত্যেকটি রেখায় আঁকা হয়েছে। এবং ক্ষণ আনন্দের কী আশ্চর্য উদ্ভাস এই গানে! আবার ১৯২৩ সালে রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদের বাড়িতে এসে রয়েচেন, তখন স্ত্রী হেমকুসুম বাড়িতে তত্ত্বাবধানের জন্য এসে হাজির হয়েছেন। দিন কয়েক থাকলেন, রবীন্দ্রনাথ যে কদিন থাকলেন। রবীন্দ্রনাথ যেই চলে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে তিনিও চলে গেলেন। তখন অতুলপ্রসাদ লিখলেন --- 'ওগো নিঠুর দরদী তোমার কাঁটায় ভরা মন, ফুলে ভরা বন।' কী আশ্চর্য জীবনের পরীক্ষা। গে লাপফুল ফুটিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু তার মধ্যে কাঁটা রেখেছ। এতসুন্দর আমার এই সস্মিত দাম্পত্য জীবন, তারমধ্যে গোটা একটা বিরহের কাঁটা ফুটিয়ে দিয়েছে। এই আসা যাওয়া দুটো নিয়েই গান।

রজনীকান্তের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে উনি থাকতেন রাজশাহীতে। ইস্টবেঙ্গল মেলে করে কলকাতা এসেছেন। শিয়ালদার ক

াছে এক মেসে উঠেছেন। ১৯০৫ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন চলছে সারা কলকাতায়। রবীন্দ্রনাথ গান গাইছেন ---'বাংল ার মাটি বাংলার জল', দ্বিজেন্দ্রলাল গান গাইছেন ---'বঙ্গ আমার জননী আমার।' ছেলেরা এসে বলছে আপনার কাছে একটা গান চাই, আমরা বিকেলে গাইব সেই গান। রজনীকান্ত বলছেন আমি তো এইমাত্র সারারাত জেগে ট্রেনে করে এসে পৌঁচেছি। কী করে গান লিখব। না লিখতেই হবে আপনাকে। ঠিক আছে। আধখানা লিখেছ অন্তরা পর্যন্ত এই গানটা এখন ছাপা হোক। আমার প্রেসে আমি ছেপে দিচ্ছি, ছেলেরা নিয়ে অনুশীলন কক তারপর বাকিটুকু তৈরি করা হবে। বা কিটুকুও তৈরি করা হল। তারপর রজনীকান্ত নিজেই বলেচেন, বিকেল বেলা যাচ্ছি রাস্তা দিয়ে, দেখি দূর থেকে ছেলেরা গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে ---'মায়ের দেয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।' নিতান্তই ছাত্রদেরঅনুরোধে লেখা আকস্মিকভাবে। সারারাত জেগে এসে ট্রেন থেকে নেমে এরকম দাণ আকস্মিক গান যে লিখেছেন এখনও পর্যন্ত আমাদের জীবনে এই গান অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

প্রত্যেক গীতিকারের জীবনে প্রয়োজন আছে গান লেখার প্রেরণা তৈরি করার। সে প্রেরণা হতে পারে ব্যক্তি। প্রেরণা হতে প ারেপ্রকৃতি। প্রেরণা হতে পারে প্রাকৃতিক বিপর্যয় পর্যন্ত। এমনও হয়েছে, একটা অনুষ্ঠান শান্তিনিকেতনে পরিকল্পনা করা হয়েছে। সব ঠিকঠাক, গান রিহার্সাল হয়ে গেছে। বিকেলবেলা অনুষ্ঠান হবে। সুরেন্দ্রনাথ কর আর নন্দলাল বসু আম্রকুঞ্জে স্টেজ তৈরি করেছেন। সুন্দর করে সাজিয়েছেন দেবদাপাতা দিয়ে, শিকলি দিয়ে তাঁদের নিজস্ব কাকর্ম দিয়ে। অপূর্ব একটা মঞ্চ তৈরি হয়েছে। হঠাৎ তিনটে চারটের সময় ভয়ঙ্কর ঝড়। এমন ঝড় এল যে মঞ্চটাই উড়ে গেল। অনুষ্ঠান করা তো অসম্ভব। সবাই বুঝল আজকে আর অনুষ্ঠান হবে না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের ঘরে বসেই বুঝলেন যে আজকের সমস্ত অনুষ্ঠ ানটাই পণ্ড হয়ে গেল। উনি তারপর খবর পাঠালেন। ঝড় শান্ত হয়ে গেল বৃষ্টি থেমে গেল। বললেন যে, লাইব্রেরি ঘরের কোণে চলে এসো বারান্দায়, আমি একটা নতুন গান লিখেছি, সেই গানটাই তোমাদের শোনাব ---'দ্রবেশে কেমন খেলা, কালো মেঘের ভ্রুকুটি।' অনুষ্ঠান বানচাল হয়ে গেল কিন্তু একটা গান তৈরি হয়ে গেল। এই যে সারাক্ষণ গানের মধ্যে থাক া। এবং সময় যে সর্বদা অনুকূল তা নয়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে আনুকূল্য সবক্ষেত্রে প্রয়োজন হচ্ছে না। প্রতিকূলতা থেকেও গান তৈরি হচ্ছে। কোনও জিনিষটাকেই নষ্ট করছেন না। ওঁর যে কবিতা আমরা পড়ি- 'জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেল া' সে তো শুধু বাক্যমাত্র নয়, জীবন দিয়েই তো প্রমাণ করে দিয়েছেন, যে একটা ঝড় এসেছে --- 'ঝড় নেমে আয়, ঝড় নেমে আয়' ---নিজেই চাইছেন তার বর্ণনা আছে। সেই বর্ণনার মধ্যে লেখা আছে সেই বাতি' ---এই গান যখন লিখেছেন তার বর্ণনা আছে। সেই বর্ণনার মধ্যে লেখা আছে যে তিনি ছুটছেন, দিনু ঠাকুরের বাড়ির দিকে ছুটছেন। জোববা সামল াচ্ছেন এক হাতে, চোখের চশমা এক হাতে। সমস্ত চুল ঝড়ে উড়ছে। পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে আসছেন তিনি। দিনুবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, ওই তো দিনু সেতারটা ধর, এস্রাজটা ধর, যা আছে ধর একটা; আমার গানটা এসে গেছে --- ''যেতে গ ানটা সঙ্গে সঙ্গে দিনুবাবু গাইলেন। তারপরের বর্ণনায় পাওয়া যাচ্ছে, তারপর গানের পর গান। অনেকক্ষণ ধরে গান চলল দুজনে নিলে। এই যে গান আনন্দ, ঝড়কে সাথী করে গানটা যে ভিতর থেকে উঠে চলে এসো। মনে পড়বেই এই কথ া যে, প্রমথনাথ বিশী তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' বইর মধ্যে তাঁর ছাত্রজীবনের স্মৃতি যেটা উদ্‌ঘাটিত করেছেন, একদিন আপনমনে যাচ্ছিলাম হঠাৎ দেখলাম আকাশে কালো মেঘ। গুদেব আসছেন এবং তিনি যেন খুব আনমনা, কোনে াদিকে তাঁর নজর নেই। সামনে একটা মেহেদির বেড়া। সেই মেহেদির বেড়াকে পর্যন্ত উপেক্ষা করে তাকে ঠেলে চলে য াচ্ছেন। কাছাকাছি যেতে দেখি উনি গুনগুন করছেন--- 'ভ্রমর সেথা হয় বিবাগী নিভৃত নীল পদ্ম লাগি রে।' বুঝলাম ওর গান এসে গেছে। সেই গান তো আমরা সবাই জানি --- 'আমি কান পেতে রই।' সেই অপূর্ব গানটি যখন এসেছিল তখন তিনি একদমই আত্মস্থ ছিলেন না দেখা যাচ্ছে। পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে দিনুবাবুর বাড়ির দিকে ছুটছেন যে এই গানট াকে এক্ষুনি ধরতে হবে। প্রমথনাথ বিশী ছাত্র হিসেবে লক্ষ করে তাঁর স্মৃতিকথায় ভাগ্যিস লিখে গেছেন। সেজন্য আমরা জ ানতে পারলাম ঐ গানের আখ্যান।

এইখানে মনে পড়ে গেল, সব গানের আখ্যান তো তাহলে লেখা হয় নি। এবং এটা তো আমাদের মস্ত বড় ক্ষতি যে আমর া রবীন্দ্রনাথের সব গান ---অনেক গান রচনার ইতিহাস -ই জানলাম না। কীভাবে কখন কীরকম গুমরে পড়ে তিনি গান লিখেছিলেন, কী আনন্দে, কী বেদনায়, কী নিঃসঙ্গতায় কোন্ গান উঠে এসেছে কেউ যদি সেই কাহিনি লিখত। তাঁর পাশ াপাশি কেউ তো থাকত না সেভাবে। তাহলে আমরা তাঁর আরও অনেকগানের বিবরণ পেতাম। যেখান আমরা অমল হে

ামের স্মৃতিকথায় পাই। চা বন্দোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথায় পাই। একদিন শান্তিনিকেতনে গেছেন ওঁরা। রবীন্দ্রনাথের নিজের যে বাড়ি সেই বাড়িতে তাঁরা স্থান পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ দোতলায় শুয়ে রয়েছেন, ছোট একটা ঘরে। পাশের ঘরে ওঁরা দুজন অমল হোম আর চা বন্দোপাধ্যায়। দুজনই অসম্ভব রবীন্দ্র অনুরাগী ছিলেন। মধ্যরাত্রে হঠাৎ একটা গানের আওয়াজ তাঁদের কানে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ছাদে গিয়ে দেখলেন যে জোৎস্নায় ছাদ ভেসে যাচ্ছে। ছাদের মধ্যে একটা পাথরের বেঞ্চিতে রবীন্দ্রনাথ বসে আপনমনে গান তৈরি করচেন। আস্তে আস্তে চা বাবু অমল হোমকে বললেন, অমল, এসো পিছনে এসে আমরা চুপচাপ বসি। চুপচাপ বসে যে গানটা শুনলেন 'আজ জোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে।' উনি নিজে ছাদে বসে নিজের বিরল মুহূর্তে আত্মবেদনায় এই গানটি গাইছেন। জগতের সমস্ত আনন্দ যজ্ঞে তাঁর নিমন্ত্রণ। কিন্তু আজকে আমি যাব না। আমি আজকে এখানে থাকব। সেই জোৎস্না রাতে সবাই যখন বনে গেছে, তখন একাকী নিঃসঙ্গ এক বেদনার্ত মানুষের গান আপনমনে গেয়েই চলেছেন কোনও প্রত্যাশা তো নেই। সেই গান তারপরে চিরন্তন হবে, আমরা গাইব, ভবিৎষ্যৎকালের মানুষ পেয়ে যাবে একটা আশর্চ্য গান একথা তখন ভাবাই যায়নি। কিন্তু সাক্ষী রয়ে গেলেন দুজন, অমল হোম আর চা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাগ্যিস লিখলেন।

কিংবা নন্দলাল বসুর স্ত্রীর স্মৃতিকথায় যেটা জানা যায় যে, একদিন আশ্রমের ছাত্ররা তাদের রাত্রিবেলায় খাবার ডাইনিংম থেকে শেষ করে দল বেঁধে গাইতে গাইতে যাচ্ছেন আপনমনে তাদের ছাত্রাবাসের দিকে ---'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে উছলে পড়ে আলো।' গনের মধ্যে হয়তো একটু সুরবিকৃতি ছিল। নন্দলাল বসুর স্ত্রী স্মৃতি থেকে বলছেন যে, সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বারান্দার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে গানটি গাইতে শু করলেন। সেই অপূর্ব মুহূর্ত তো আমরা কেউ দেখতে পাইনি। খুব জানতে ইচ্ছে করে। সেই অত্যন্ত ভাগ্যবান ছাত্রদের কথা মনে পড়ে। যারা একটা ভুল গান গেয়ে রবীন্দ্রনাথকে সেই বাইরে বার করে এনেছে। এবং তিনি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সেই গান রবীন্দ্রনাথ নিজেই গাইতে সু করলেন। সেই গান ---ও রজনীগন্ধা তোমার।

এবার তাঁর ছোটবেলার কথা বলা যাক। এটি তাঁর যৌবনকালের গল্প। মানুষটি রসিক ছিলেন খুব। যদি এই বিবরণ সত্যি হয়, লিখিতভাবেই আছে, আমি সেই বিবরণ দিচ্ছি। তাঁর ভাইপো আর ভাইঝি সুরেন্দ্রনাথ আর ইন্দিরা দেবী দু'জনেই ছিলেন তাঁর মেজদা সত্যেন ঠাকুরের ছেলে আর মেয়ে। তাদের সঙ্গে খুব ঠাট্টা পরিহাস করতেন মাঝেমাঝে। এই ইন্দিরা দেবী চৌধুরী অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর স্মৃতিকথায় আছে একটা জায়গায় যে, রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর স্মৃতিকথায় আছে একটাজায়গায় যে, রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন প্রেসিড়েন্সির বেকার ল্যাবরেটারিতে গান গাইতে। আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের বাগানে শুয়েছিলাম। শুনলাম রবীনদ্রনাথ এসেছেন। সঙ্গে এসেছেন তাঁর সুন্দরী ভাইঝি। সেই সুন্দরী ভাইঝি হচ্ছেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। তখনকার যুবসমাজ সবাই ছুটে গেল তাকে দেখতে। প্রমথ চৌধুরী খুব সুন্দরভাবে লিখেছেন। আমি অবশ্য গেলাম না, মাঠে শুয়েই রইলাম। তার পরের লাইন হচ্ছে, পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। এরকম একটা অত্যাশর্চ্য চমৎকার মন্তব্য খুব কম পাওয়া যায়। কিন্তু সেই ইন্দিরা দেবী চৌধুরী যখন সত্যেন ঠাকুরের বাড়িতে থাকতেন, অর্থাৎ তাঁর কুমারী জীবন। খুবই ছোট। ত্রয়োদশী কী সপ্তদশী। তখন ওই বাড়ির যে বাগান সেই বাগানের একদম বাইরের একটা জায়গায় একটি ছেলে রোজই এসে দাঁড়াত। রবীন্দ্রনাথ লক্ষকরে মনে করলেন যে, ছেলেটি আসলে ইন্দিরাকে দেখতে আসে। রবীন্দ্রনাথ প্রায় ফাজলামি করেই বলা যায়, পরিহাস করেই একটাগান লিখলেন 'সখি প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে/ তারে আমার মালার মালার একটি কুসুম দে।' এরকম একটা অদ্ভুত উপলক্ষে পরিহাস করে লেখা বটে, কিন্তু গানটি অচিরেই তার পরিহাসের ভঙ্গিটা ভেঙে একটা ভালো গানের দিকে চলে গেল। এরমধ্যে একটা অদ্ভুত কৃৎকৌশল ছিল। গানটি যেভাবেই শু হোক, যত সামান্য আয়োজনেই তার শু হোক গানটা কিন্তু একটা অসামান্যতার দিকে অন্তরা থেকেই বাঁক নেয়। এবং অন্যদিকে চলে যায়। এরকমই শোনা যায় তাঁর যে নাতনি ছিল পুপে, যে খুব কোলের মধ্যেকলবল করে, বাচচা শিশু যেমন কথা বলে কলবল করে। রবীন্দ্রনাথ সেইটা শুনে লিখলেন 'অনেক কথা যাও যে বলে কোনও কথা না বলি। তোমার ভাষা বোঝার আশায় দিয়েছি জলাঞ্জলি।' প্রত্যেকটি শিশুর কথা বোঝার আশা আমরা সত্যিই জলাঞ্জালি দিই, কিন্তু কেউ তো গান লিখিনি। তারপরে 'যে আছে মম গভীর প্রাণে' -বলে সঙ্গে সঙ্গে অন্তরাতে একটা গভীরতায় বাঁক নেয়, তখন গানটা আমাদের গান হয়ে যায়। তখন আমরা ভাবি ভাগ্যিস পুপের কথা বোঝা যেত না। সেই পুপে বড় হয়েও নিশ্চয়ই শুনেছে এই গানের এরকম নানা

উপক্ষিক গান সামান্য জায়গা থেকে অসামান্য জায়গায় চলে গেছে। যেমন ধরা যাক, একবার কাথিয়াবাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে একটি পরিবারের সঙ্গে তাঁর আলাপ হল। তাঁদের বিশেষ একটা নাচের ভঙ্গি ছিল। বসে বসে উঠে দাঁড়িয়ে একটা খঞ্জনি বাজাত। রবীন্দ্রনাথ সবাইকে দেখালেন সে দৃশ্য। আশ্রমের সবাইকে। 'দুই হাতের কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে।' তা এই যে বালিকার খঞ্জনিটা কালের মন্দিরায় চলে যায় এইখানেই রবীন্দ্রনাথের রসায়ন। এই জায়গাটাতে এসে আমরা স্তব্ধ হয়ে ভাবি একটা সামান্য উপলক্ষ থেকে এই কালের মন্দিরার আওয়াজটা তাঁর কানের মধ্যে বেজে উঠল।

এখন কথা হল যে ওই কাথিয়াবাড়ের মেয়েটির নাচের অনুষঙ্গে যেমন করে গান তৈরি করলেন। তেমনি প্রথম শা ন্তিনিকেতনে যায় একটা কুয়ো খুড়ে, পাতকুয়ো খুঁড়ে জল আনা হল তখন --- 'এস এস তৃষ্ণার জল' ---গান তিনি লিখেছেন। এরকম ছোটখাট উপলক্ষে অনেকগান তঁ ার কাছে পাওয়া যাবে। কিন্তু আমি এখন আরও গভীরতর গানের দিকে আস্তে আস্তে যাওয়া চেষ্টা করব।যেমন ধন গান থেকে গান। সেই কথা যদি আসে, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সত্যেন ঠ াকুর তাঁর মেজদা কারোয়ারে থাকতেন, তখনকতগুলি কানাড়া গান ইন্দিরা দেবীর কাছে চলে এসেছিল। কতগুলি ছোট ছোট ভিক্ষুক গান গাইতে আসত। তাদের গান ইন্দিরা দেবী তুলে নিয়েছিলেন। মতান্তরে সরলা দেবী। দু'টো মতই পাওয় া গেছে। যাইহোক গানগুলো রবীন্দ্রনাথকে শোনানো হল, যে আমরা কতগুলো মজারগান শুনেছি। রবীন্দ্রনাথ তখন বেশ ছোট। ১৮৮১ সাল, তার মানে কুড়ি বছর বয়স রবীন্দ্রনাথের। 'বাল্মীকিপ্রতিভা'রচনার সময়। এবং সেই গান হচ্ছে 'সখি বাবা মারণ কিকি বেড়ে বর গিরি এ / মদন মনোহরণ/ সখি বাবা মারণ কিরি বেড়ে বর গিরি এ।' এই গানটা শুনে 'বড় আশা করে এসেছি গো কা'ছে ডেকে লও/ ফিরায়োনা জননী, বড় আশা...' ---কোনগান থেকে কোন গান। একটা স ামান্য গানকে অবলম্বন করে একটা অসামমান্য গানের বাণী যোজনা শুধু নয়। এই গান আমরা কতগুলো উপলক্ষে গেয়ে থাকি। কিন্তু গাইবার সময় আমাদের মনে থাকে না যে কত সামান্যভাবে গানটা পাওয়া গেছিল ভিখারিণীর কন্ঠ থেকে। কিন্তু তার চেয়ে আশর্চ্য 'পূর্ণাচন্দ্রানলে কী মনোহরণে মন্মথমোহনে মোহিনী/ লাক লোক কোমলিনী / লাক লোক কে ামলিনী' ---'আজিশুভদিনে পিতার ভবনে অমৃত সদনে চল যাই/' এই ব্রহ্মসঙ্গীতের মধ্যে যে উদাত্ততা দেখা গেল এটা মূল গানের মধ্যে ছিল না কিন্তু। রবীন্দ্রনাথ যখনই এই ধরনের কাজ করছেন গান থেকে গান, তার আখ্যানগুলো যদি অ ামরা আলাদা করে কোনও দিন চিহ্নিত করতে পারি, গেয়ে দেখতে পারি তাহলে দেখব যে শুধু একটা গানের সুরে আর একটা গানকে বয়ন করছেন এমন নয়। গানের মধ্যে এমন জিনিস এনে দিচ্ছেন যা আগে আমরা কোনও দিন শুনিইনি। যেমন ধরা যাক, উনি যে গগন হরকরার গানটা তৈরি করেছিলেন। যে গানটা অনেকটা আমি কুষ্টিয়া অঞ্চল থেকে সুরটা যেভাবে পেয়েছিলাম খুবই প্যাথোজে ভরা এবং খুবই ধীর লয়ের গান। সেটা হচ্ছে 'আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যেরে...। আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যেরে/ হারিয়ে সেই মানুষে হারিয়ে সেই মানুষে ত ার উদ্দেশে দেশবিদশে/ ওরে দেশবিদেশে বেড়াই ঘুরে/ কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যেরে।' গানটাকে রবীন্দ্রনাথ ঠিক বিট এবং ফ্রেমিং এ ফেলে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি .../' এই যে রূপান্তরটা করলেন সাংগীতিকভাবে গানটাকে কিন্তু তিনি পুনর্নির্মাণ করলেন বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথের গানে তিনটে দিক আছে। একটা হচ্ছে তার musical aspect শুধু গান হিসেবেই যদি দেখি, শিল্প হিসেবেই যদি দেখি তাহলে দেখব তার একটা স্বাতন্ত্র্য রয়েছে; অন্যসব বাংলা গানের থেকে অন্যরকম। দ্বিতীয় কথাটি asthetic value থাকে নিছক আমাদের গান শোনা গান গাওয়া নয়, তার মধ্য থেকে জীবনের একটা সত্যকে নিষ্কাশিত করা, তার মধ্যে একটা সৌন্দর্যের সাক্ষাৎকার এবং একটা সমতা সামঞ্জস্য এনে দেওয়া, সেইটা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কাজ। অ ার তৃতীয় কাজ যেটা সেটাকে আমি বলি cerebral value অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে একটা মানবের শুশ্রূষা অ াছে। উনি আমাদের গানটাকে শুধু কানের বিষয় না করে আমাদেরর মনের বিষয় করে দিলেন এবং বোঝালেন যে গানট ার সঙ্গে রয়েছে আমাদের একটা মনেরও ইতিহাস সেটাই হয়তো তাঁর বলবার কথা। সেইজন্য তাঁর গানের মধ্যে আমরা যখনই কিছু দেখি তখনই দেখি যে তিনি নিছক গান লিখছেন না, সেইসঙ্গে গানের ভেতর থেকে উনি ওঁর ভাষায় বলা য ায় যে গানের বেদনাকে এনে দিচ্ছেন। এটাও তাঁর একটা মস্ত বড় পাওয়া। কিন্তু কীরকম করে গান লিখতেন তিনি? এইভ াবে --- 'আজ সকালে বসে আমার একটা নতুন গানের সুর দিচ্ছিলুম।' এই কথাটা শুনে মনে পড়ে গেল, প্রমথ চৌধুরী

বলেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের গান আর সুর গলাগলি করতে আসত। একসঙ্গে 'দুটো নাকি আসত। কিন্তু তার উল্টোটাও আমরা দেখেছি। গান আগে লিখেছেন সুর পরে দিয়েছেন, সেরকম ঘটেছে। সুরের আভাসটা আগে এসেছে, বাণী পরে বসিয়েছেন। এখানে তো অন্তত একটা দেখা গেল। 'আজ সকালে বসে বসে আমার একটা নতুন গানের সুর দিচ্ছিলুম। গ াইতে গাইতে কাজকর্মের সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। প্রুফগুলো পড়ে রইল। দুপুর বেজে গেল। রৌদ্রের আলোক এবং তাপ গভীর তীব্র হয়ে মস্তিষ্কেরমধ্যে প্রবেশ করতে লাগল। আজ আর কিছু হল না।'

'আজ আর কিছু হল না' --- কথার মানে হচ্ছে বাস্তবে য হয় দৈনন্দিনে যেমনভাবে হয়, কিছু লেখা, কিছু বলা, কিছু কাজ সেদিন আর কিছু হল না এবং হল না বলে তাঁর কোনও দুঃখও নেই কিন্তু। আস্তে আস্তে সব কিছুই তিনি ওই গানটার উপরেই ছেড়ে দিলেন। তারপরে আর একটা জায়গায় বলছেন; 'আজ নাগাদ প্রায় পনের ষোল বছর ধরে খুব কষে গান লিখছি। গান লিখতে যেমন আমার নিবিড় আনন্দ হয় এমন আর কিছুতেই হয় না। এমন নেশায় ধরে যে তখন গুতর ক াজে গুত্ব একেবারে চলে যায়। বড় বড় দায়িত্বের ভারাকর্ষণটা হঠাৎ লোপ পায়। কর্তব্যের দাবীগুলোকে মন একধার থেকে নামঞ্জুর করে দেয়।' এটা শুনে নিন ভালো করে, যে 'কর্তব্যের দাবীগুলোকে মন নামঞ্জুর করে দেয়' শুধু গানের জন্য। এই যে গান ---'এস এস ফিরে এস' -এই গানটা যখনলিখছেন আর কি তখন এইসব ঘটনা তাঁর ঘটছে, যে সমস্ত প্রুফগুলোও পড়ে রইল, দুপুরটাও বেজে হল-আমরা একটা ভালো গানপেলাম। তার ইতিহাসটা তিনি এইভাবেই লিখেছেন। কিন্তু সর্বত্র সর্বদা সব গানের ক্ষেত্রে এরকম লেখা নেই। কিন্তু একটা জায়গায় এন্ড্রুজের স্মৃতি যদি আমরা মা নি তাহলে দেখা যায় এন্ড্রুজ বলছেন, রবীন্দ্রনাথ নিজেও লিখছেন, 'আমি বেশিরভাগ গান কিন্তু স্নানঘরে নাবার সময় রচন া করেছি। নাবার ঘরে স্নান করতে করতে আমি অনেক গান লিখেছি। এবং গান লেখার সুবিধে হচ্ছে এই যে তখন আর কেউ আমার কাছে থাকে না। আমি একেবারে একা। মাথায় হয়তো একঘটি জল ঢেলে চুপচাপ অনেকক্ষণ কাটিয়েও দেওয়া যেতে পারে। কোন তাড়া নেই। তখন গুনগুন করে আমি একটা করে গান তৈরি করি।'

স্নানের ঘরে কিন্তু অনেক গান তিনি রচনা করেছেন। এন্ড্রুজ এক জায়গায় বলেছেন, যে, একদিন গিয়ে দেখি, গুনগুন করে গান গাইছেন এবং স্নান করছেন। হঠাৎ চিৎকার করে চাকর বনমালীকে ডেকে বললেন, দিনুকে ডেকে নিয়ে আয়, আর অ ামার এই বাথমের জানলার তলায় দাঁড়াতে বল। এখন বলাবাহুল্য এর পরের বিবরণটা আর নেই। কিন্তু আন্দাজ করতে পারি যে, বেচারি দিনুকে চলেই আসতে হল তখন এক কাগজ পেনসিল নিয়ে বাথরুমের পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটি নতুন গান তৈরি হয়ে গেল রবীন্দ্রনাথের। ওই যে তৎক্ষণাৎ যে গানটা না গাইলে তার আর মুক্তি নেই। রবীন্দ্রনাথ এক জ ায়গায় বলেই ফেলেছেন, আমার নিজের গান আমাকে আর তোরা লিখতে দিলি কোথায়। সবসময় তো তোদের হুকুম ত ালিম করতে করতে আমার প্রাণ বেরিয়ে গেল। এবং হুকুম তামিল করারও প্রচুর বিচিত্র ঘটনা আখ্যান আমাদের জানা অ াছে।

কিছুই নয় সামনে শারদোৎসব , পুজোর ছুটি হবে। সবাই এসে বলল, গুদেব একটা নতুন নাটক চাই। অতএব 'শারদে াৎসব' লেখা হল। অতএব শারদোৎসবের গান লেখা হল। এইভাবে নতুন গান তাঁকে লিখতেই হতো, অনবরত লিখতে হতো। বনমহোৎসবের গান লিখতে হতো। আশি বছর বেঁচে ছিলেন।। রজনীকান্ত পঁয়তাল্লিশ বছর বেঁচে ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল পঞ্চাশ বছর বেঁচে ছিলেন। অতুলপ্রসাদ তেষট্টি বছর বেঁচে ছিলেন। নজলের গানের জীবন চল্লিশ বছরও হবে না, তার চেয়েও কম। তারপরেই তো তাঁর সেই মূক অবস্থা আসে। তাহলে এই গানের জীবন, দীর্ঘ জীবন শুধু নয়, সেইসঙ্গে দীর্ঘ দীর্ঘতর প্রেরণা, ব্যক্তিক সামাজিক পারিবারিক। এমনকী প্রচুর ব্রহ্মসঙ্গীত লিখতে হয়েছে একদা শুধু ব্র াহ্মসমাজের ডাকে। প্রচুর গান লিখেছেন জীবন, যৌবনের প্রথম দিকে। শান্তিদেব ঘোষের ভাষও যদি আমরা মানি তাহলে জানব, মাঝে মাঝেই গুদেব ডেকে বলতেন, গান শুনতে ইচ্ছে করছে। ---কোন্ গান গাইব? ---ওই আমি আজকাল যে সব গানগুলো লিখছি সেইসব গানগুলো। সেগুলো শোনাতেন, নতুন নতুন গান, আর গুদেবকে গান গাইতে বললে সবসময় পুরোন গান গাইতেন। সেই গীতাঞ্জলির যুগের গান, কি তারও আগের গান। এগুলোই তিনি গাইতেন। শান্তিব াবু একদিন জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কেবলই পুরোন গান করেন, আমাদের নতুন গান গাইতে বলেন কেন? বললেন , নতুন গানগুলো আমার মনে থাকে না। নতুন গানের সুর আমার মনে থাকে না। তার মানে উনি বলতে চাইলেন, যৌবনের দিনগুলোতে গানগুলির সঙ্গে আমরা মনে থাকে না। তার মানে উনি বলতে চাইলেন, যৌবনের দিনগুলোতে গানগুলির

সঙ্গ যেভাবে ওতপ্রোত জড়িয়ে গেছিলেন পরবর্তীকালে আশ্রমিক জীবনে, আশ্রমবাসিক পর্বে নানান ঘটনায় নানাভাবে তিনি যে গানগুলো তৈরি করেছিলেন তার সঙ্গে তাঁর কতখানি আত্মিক যোগ ছিল সে সম্বন্ধেআমরা আজ প্রশ্ন তুলতে পারি। গানগুলো খুবই সুন্দর। গানগুলো আমাদের ভালোও লাগে এবং নৃত্যনাট্য বা গীতিনাট্যে সে গানগুলোকে অচ্ছেদ্য বলেও আজ আমাদের মনে হয়। খুবই চমৎকার ঠিকই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিজের মনের সায় কতটা ছিল সে নিয়ে আজকে সন্দেহ করার কারণ আছে।

যেমন ধরা যাক, সকালবেলা যখন শৈলজাবাবু গেলেন নতুন গানের জন্যে। তিনি একটা গান তৈরি করে দিলেন --- 'আজি ঝরঝর মুখর বাদল দিনে।' এই লয়ে টানা হবে গানটা। বিকেলবেলা শৈলজাবাবু বললেন, উনিও বললেন, যে গানটাকে একটা তালে দিলে ভালো হয়, তাহলে ছেলেদের সুবিধে হয়, নাচেরও সুবিধে হয়। ---'আজি ঝরঝর মুখর বাদল দিনে/ জানিনে জানিনে কিছুতে কেন যে মন লাগে না / ঝরঝর মুখর বাদল দিনে।' করলেন বটে, আমাদের মনে রাখতে হবে দুটি সুরই কিন্তু রেখে দিয়েছেন। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে কোনটাকে বর্জন করেননি। তার মানে কি গানের সুরান্তরটি রেখে দেওয়ার পিছনে একটা জিনিস বোঝা যায় ---স্রষ্টার অপরিমিত ক্ষমতা। বোঝাতে চাইছেন যে দু'ভাবেই না হয় দেখলাম ---ঝরঝর মুখর দিনকে। একটা টানাভাবে দেখলাম ধীর লয়ে; একটা তালে ফেলে দেখলাম নাচের ছন্দে। এভাবে দেখা যায়। তা এত যে মুখরতা তাঁর গান নিয়ে আমরা এত কথা বলে যেতে পারছি তার প্রধান কারণ কিন্তু তুলনায় অন্য গীতিকারদের সম্বন্ধেআপনাদের সামনে এত উদাহরণ দিতে পারব না। তার প্রধান কারণ হচ্ছে সেই গান রচনার সাক্ষী কে? সাক্ষী কেউ ছিল না। সেই গান রচনার সময় পরিপার্শ্ব কেমন ছিল জানা যায় না।আমাদের বিশিষ্ট গীতিকারদের জীবনের আত্মকথা প্রায় নেই। রবীন্দ্রনাথকে বহুক্ষেত্রে বলিয়ে নেওয়া হয়েছে। সবকথা ছেড়ে দিলেওশুধু ধূর্জটিপ্রসাদ ও দিলীপকুমার রায় তাঁকে এতবার চিঠি লিখে তাঁকে খুঁচিয়ে এতকথা লিখিয়েছেন, এতকথা বলিয়েছেন; শান্তিদেববাবু শৈলজাবাবু নানাভাবে তাঁর কাছ থেকে যেটা আদায় করেছেন তার ফলে তাঁরআত্মজীবনীতে লিখেছেন, কীভাবে লোকসঙ্গীতের সুর থেকে তিনি স্বদেশী গানগুলো তৈরি করছেন। ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী দেখিয়েছেন তাঁদের রবিকাকা ছোটবেলার গানগুলোকে কীভাবে সুরান্তর করে নতুনভাবে দেখিয়েছেন। এই ব্যাপার যেটা খুব আশ্চর্য করে মনে হয় আমার, সেটা হচ্ছে, শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর বর্ণনাটা যে দিয়ে ছিলেন। শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। রবীন্দ্রনাথের গান রচনার একটা পুরো বিবরণ আপনাদের কাছে পড়ে শোনাই। খুব ছোট। ---জোড়াসাঁকোতে একটা মোটামুটি সাহিত্যের আড্ডা বসেছে। প্রচুর বিখ্যাত লোক এসেছেন। অনেক গল্প হচ্ছে। নজল ইসলামও হাজির আছেন। কিছু আলাপ আলোচনা গান আবৃত্তি হয়ে গেছে। সভাস্থল নিস্তব্ধ। এবার শোভনলাল তাঁর বর্ণনা দিচ্ছেন --- 'স্টুডিও ঘরের গোল জাপানী জানলার বাইরে শিশুগাছের ফাঁক দিয়ে পূর্ণিমার চাঁদ উঠে এসেছে। সেই জানলার ধারে একটা নিচু সোফাতে বসে রবীন্দ্রনাথ একটি ছোটখাতা আর পেন্‌সিল নিয়ে মাথা হেঁট করে মাঝে মাঝে কী লিখছেন। তাতে গুনগুন করে সুর ভাঁজছেন। বেশ অনেকটা সময় কেটে গেল। ক্রমে সভার লোকেরা কেউ কেউ একটু সরে গিয়ে টিনের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। রবীন্দ্রনাথ তখনও নিজে মনে গুনগুন করে চলেছেন। অনেকক্ষণ বাদে সমস্ত গানটার সুর যখন মনে মনে বেশ আয়ত্ত করে নিয়েছেন, তখন সবাই আবার সভাস্থ হয়ে উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায় শান্ত হলেন। রবীন্দ্রনাথ গলা ছেড়ে গান শু করলেন ---'মাধবী হঠাৎ কোথা হতে এল ফাগুন স্রোতে এসে হেসেই বলে যাই যাই যাই।' এই গানটা প্রচুর মানুষের মধ্যে একা হয়েলিখছেন। এটা লক্ষণীয় যে, জনসমাবেশের মধ্যে বসেও কীরকম চট করে গানের জন্য আলাদা হয়ে গেলেন। এবং পেন্‌সিলের মধ্য দিয়ে একটা যুগান্তকারী গান লিখে ফেললেন বলা যায়। মাধবী হঠাৎ কোথা হতে ---এ গান আমরা যখন শুনি, যখন গাই তখন মনে হয় যে একটা অপরূপ গান। কিন্তু কী অনায়াসে গানটা লিখেছিলেন আপনমনে, ইতিহাসটা রয়ে গেল শোভনলালের স্মৃতিকথায়।

এইরকম স্মৃতিকথা শান্তিদেবও বলেছেন। যে, যখন তাঁর শেষ জন্মদিন, বৈশাখ মাস, এবার নববর্ষ এসেছে। নববর্ষের সময়আপনি কি কিছু বলবেন না? তখন তাঁর সচিব অমিয় চক্রবর্তীকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, নববর্ষে আমার যা বাণী তা গদ্যাকারে লিখতে চাই। এবং সেটা তিনি মুখে মুখে বললেন --- 'সভ্যতার সংকট।' সেই সভ্যতার সংকটের শেষ কথাটা ছিল, 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।' আপনি কি একটা গান লিখবেন না? তখন বললেন, হ্যাঁ। একটা গান আমায় তো লিখতেই হয়। এবং তার পান্ডুলিপি পাওয়া গেছে। তাতে দেখা যায় যে ---ওই মহামানব আসে গানটা প্রথমে তিনি

কবিতার মতো লিখেছিলেন। অনেকগুলো পঙ্‌ক্তি তার। সেটা মৈত্রেয়ী দেবীর হাতে লেখা। তার পরের শ্রাবণে মারা য াবেন। তখন শান্তিদেব বললেন যে, আপনার সুর দিতে বোধহয় কষ্ট হবে। হ্যাঁ গানটা বড্ড বড়। খানিকটা সুর দিয়ে বললেন আজকে পারলাম না, কাল আবার দেব। তার পরদিন লম্বা গানটা থেকে গানটাকে ছোট করে নিয়ে এখন যে র ূপে গানটা আমরা পাই ---'ওই মহামানব আসে' ---এই গানটা তিনি রচনা করলেন। ধরতে গেলে এটাই রবীন্দ্রনাথের শেষ গান। কিন্তু এই শেষ গান রচনার ইতিহাসটা বিচিত্র নয় কি?

এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে উনি গান রচনার যে সব বিবরণ আমাদের দিয়ে গেছেন, যেভাবে আমরা গানগুলোকে পাচ্ছি এ বিষয়ে সবচেয়ে চমৎকার, সবচেয়ে মানে বলব, যে আমাদের পক্ষে খুব রোচক এবং অত্যন্ত আকর্ষক বর্ণনাটি শৈলজাব াবুর বইতে আছে। বইটি হল 'যাত্রাপথের আনন্দগান'। শৈলজাবাবু শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন কেমিস্ট্রির অধ্যাপক হয়ে, কিন্তু তিনি চলে গেলেনগানে। তখন তো দিনবাবু বেঁচে নেই। অনেকেই নেই চারপাশে। রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে শৈলজাব াবুর উপর খুব ভরসা করতেন। আর শৈলজাবাবুর স্বরলিপি করার অপূর্ব দক্ষতা ছিল। নিজে এস্রাজ বাজাতেন চমৎকার। সেই শৈলজাবাবুর অনেকস্মৃতি আছে রবীন্দ্রনাথের গানের। তা একবার ঠিক হল যে শান্তিনিকেতনে একটা বর্ষামঙ্গল হবে। তখন শৈলজাবাবু গিয়ে বললেন, তাঁর যেমন কায়দাছিল। উনি যেটা সত্যি নয় সেটাও অনেকসময় বলতেন। রবীন্দ্রনাথ ধরেও ফেলতেন অনেকসময়। এটা তোমার কথা নয়, তুমি অন্যের কথা বলছ। গিয়ে বললেন, ছেলেরা বলছে নতুন গান চাই। তখন বলতেন, তোমরা কি বিশ্বাস কর না আমার অনেক বয়েস হয়েগেছে? আমার পক্ষে কি সম্ভব? তে ামরা একটা করে অদ্ভুত অদ্ভুত আব্দার করছ আর আমায় লিখতে হবে। নানা ওসব আমি পারব না। যাও ছেলেদের বলে দিও। শৈলজাবাবু জানতেন যে, উনি যতই যাই বলুন গান তিনি ঠিকই লিখবেন। পরে দেখা গেল, উনি বললেন, শোন শোন হে, আমি একটা গান লিখেছি, ওগো সাঁওতালি ছেলে। গানটা দিলেন, বললেন, গানটা ভালো লেগেছে, ছেলেমেয়েদের শিখিয়ে দাও তো দেখি। ছেলেমেয়েদের শিখিয়ে দাও বলতে মনে পড়ল, আমরা এখন যেমন রবীন্দ্রনাথের গান একভাবে শুনি, শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কৌশলটা ছিল উল্টো। উনি সবাইকেই গান গাইতে বলতেন। তোমরা সকলেই এটা গাও। গানটাতো গাইতে পারবে। একটা নতুন গান তো শিখলে। তার পারফেক্‌শানের দিকে এত ঝোঁক ছিল না। উনি ভাবতেন সকলে পার্টিসিপেটকক। পার্টিসিপেশানের দিকে ওঁর ঝোঁক ছিল। এবং শুনলে অবাক হবেন যে, 'শ্যামা' বা 'চণ্ডালিকা' বা 'শাপমোচন' এইসবের অভিনয় যখন হত, তখন একাধিক ব্যক্তি শ্যামার গান, একাধিক ব্যক্তি বজ্রসেনের গান গাইতেন তাতে কিছু হানি হতো না। উনি মনে করতেন, সবাইতো গাইছে, আমার গানতো গাইছে। গান গেয়ে তো আনন্দ পাচ্ছে। এটাই তো বড় দরকার। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যেশৈলজাবাবু এইভাবে সাঁওতালি ছেলের গ ানটা লেখালেন, তারপরে বিকেলবেলা রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলছেন, শোন হে সাঁওতালি মেয়ে নিয়েও একটা গান লেখা দরকার। বলাবাহুল্য কোন মেয়ে একথা তাঁকে বলে নি। কিন্তু এই হাস্যপরিহাসের মধ্যে দিয়ে গান রচনার যে আনন্দ, তখন তো সত্তর পেরিয়ে গেছে; এবং সেই বয়স তো রসিকতা করার বয়সও বটে। কিন্তু যা হোক তিনি গান লিখলেন। ত ারপরেই তিনি আবার একটা গান লিখলেন। শৈলজাবাবু বললেন যে, আপনি একটি কাজ করুন, বেহাগ তো খুব ভালো, বেহাগসিদ্ধ আপনি, বেহাগে একটা বর্ষার গান দিন তো দেখি। অনেকদিন আপনার বর্ষার গান বেহাগে শোনা হয় না। রবীন্দ্রনাথ বললেন, তুমি তো আবার একটা অনর্থক আব্দার নিয়ে এলে; ঠিক আছে চেষ্টা করে দেখি, আমি বুড়ো হয়েছি তো এখন আর তেমন পারি না। পারি না বলে যে গানটা লিখলেন সেটা হচ্ছে 'আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে' -- --কী সাংঘাতিক গান। এতসুন্দর গান বর্ষার খুব কমই শোনা যায়। অনায়াসেই লিখে ফেললেন। ভাগ্যিস শৈলজাবাবু বেহ াগের একটা আব্দার করেছিলেন। শৈলজাবাবুর কীর্তিই ছিল তাই। উনি ছোট একটি কাগজে ছোট্ট ছোট্ট করে লিখে কীর্তন, বাউল, বাগেশ্রী --লিখে দিয়ে চলে আসতেন। কখনো লিখতেন তান দেওয়া গান। আর সেটা রেখে আসতেন একটা টেবিলে। রবীন্দ্রনাথের সামনাসামনি যাবার সাহস ছিল না। টেবিলে কাগজটা দিয়ে একটা পাথর চাপা দিয়ে চলে আসতেন। রবীন্দ্রনাথ সেটা দেখে বলতেন, আবোলতাবোল লোককে বাড়িতে ঢুকতে দাও কী করতে, যাকে তাকে ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেবে না। বনমালী অর্থাৎ তাঁর চাকর জানত রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারটা। সে বলত, ঠিক আছে ঠিক আছে। কিন্তু যথারীতি শৈলজাবাবু আসতেন এবং কাগজ দিয়ে যেতেন। এই যে বর্ষামঙ্গলের গান লেখা হচ্ছে তার মধ্যে 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল' লেখা হল এই একটা আব্দার থেকে --- 'আজি তোমায় আবার চাই শোনাবারে' হল। তারপরে, ইমনে

একটা গান হলে নয় না? ঠিক আছে--- 'এস গো জ্বেলে দিয়ে যাও'। ভেবে দেখুন যে, একটা গুচ্ছের মধ্যে কী স্ট্যানড ার্ডের গান আসছে এবং অনিচ্ছায় আসছে কিন্তু। তিনি আপাতভাবে অনিচ্ছা দেখাচ্ছেন, প্রচ্ছন্নভাবে ভিতরকার গানটা বেরিয়ে আসছে। কী অদ্ভুত। তার মানে ভেতরকার প্রস্তুতিটা কী ভয়ানক। একটা শুধু সেই এসো গো জ্বেলে দিয়ে যাও-- ঠিক তাই। প্রদীপটা তৈরি করার আছে একটু উস্‌কে দিতে হবে। শৈলজাবাবু একাদিক্রমে উস্‌কে যাচ্ছেন যে, বর্ষামঙ্গলের নতুন গান চাই। এবং তারপরে দেখছি এরকম গান এসে গেল। তারপরে শৈলজাবাবু লিখে গেলেন ছোট্ট করে একটা ক াগজে 'তান দেওয়া গান'। 'শ্রাবণের গগনের গায় বিদ্যুৎ চমকিয়া চায় ক্ষণে ক্ষণে... এই তান দেওয়া গানটাকে টেনে অ ানলেন শৈলজাবাবু। তান দেওয়া গান দিনতো একটা, সব একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে বড্ড। এইবার হচ্ছে --- 'আজি ঝরঝর মুখর বাদল দিনে' --- আপনারা একটু আগেই শুনেছেন তার দু'টো রূপ। দু'টো তৈরি হল, একটা নাচের জন্য, একটা গ াওয়ার জন্য। হওয়ার পর শৈলজাবাবু বললেন যে, দেখুন আর একটা গান হলে মন্দ হতো না। একটু বেশ তাড়াহুড়োর গান, সুন্দর তালে। ওহ্! আবার একটা! এবং সেই গান হচ্ছে --- 'স্বপ্নে আমার মনে হল' --- কী অদ্ভুত গান। এবং ওই দ্রুত লয়ের ছন্দে 'স্বপ্নে আমার মনে হল কখন ঘা দিলে আমার দ্বারে, হায়।' ওঁর একবারে ঘা দেওয়া গান সেটা অন্তরকে ঘা দিয়ে বার করে আনল সেই গানটা। শৈলজাবাবু বললেন 'দেখুন এই তো আটখানা হল, দু'ডিজিট করে দিন'। ঠিক এই ভাষাটাই আছে। শৈলজাবাবু লিখছেন, 'আমি বললাম, দু'ডিজিট করে দিন, আট কোন সংখ্যা নয়, দশ চাই।' তখন উনি বিরক্তি সহকারে বললেন, ঠিক আছে। যেই দশটা গান হল তখন বললেন, দশটা ঠিক মানানসই নয়, ডজন হলে ভ ালো হয়। এক ডজন। এবংসেইযাত্রায়একডজন হল। কারণ, শৈলজাবাবুর এরপর দুটো কাগজ রেখে এলেন। একটাতে লেখা কীর্তন, একটা বাউল। ---'শেষ গানেরই রেশ নিয়ে যাও চলে।' বললেন এবার শেষ হয়েছে তো। তখন উনি বললেন, না শেষ এখনো হয় নি। আপনি ষোলকলা পূর্ণ করে দিন। ষোলকলা পূর্ণ করে দেওয়া, তখন কী আর উপায়! তখন পনের নম্বর গান লেখা হল--- 'ওগো তুমি পঞ্চদশী।' এবং এর পরেই অনুষ্ঠানটা হবার কথা। অনুষ্ঠান চলছে রবীন্দ্রন াথ অসুস্থবোধ করলেন বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে শৈলজাবাবু বললেন আজকে আর অনুষ্ঠান হবে না। উনি যখন চলে গেলেন আর গান গেয়ে কী হবে। আসর ভেঙে গেল। পরদিন বললেন, আগামীকাল বর্ষামঙ্গল হবে। বাসি বর্ষামঙ্গলে এসে বললেন, আমি এবার শেষে গানটা, ষোলকলা পূর্ণ করতে বলেছিলে না, সেই গানটাও লিখে এনেছি --- 'রিমিকি ঝিমিক ঝরে ভাদরের ধারা'। ষোল নম্বর গান গেয়ে বাসি বর্ষামঙ্গলও হল। একটা পূর্ণবৃত্তের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গান শেষ হল। কে কে শেষ করাল? হঠাৎ শুনলে মনে হয় শৈলজাবাবুই বোধ হয় করালেন। তা নয়। ভেতরে একটা জাগ্রত শিল্পী বসেছিলেন। শুধু দ্বারে এসে একটু কড়া নাড়ার অপেক্ষা। এরকম কত গান আছে রবীন্দ্রনাথের। আমরা ক্রমে ক্রমে আরও জানব।

৯-১১-২০০৪ এ শ্রী সুধীর চক্রবর্তী বাংলা আকাদেমী সভাঘরে 'শান্তা বসু স্মারক বক্তৃতা' দিয়েছিলেন। সেই বক্তৃতাটাই এখানে প্রকাশিত হল। --- সম্পাদক



সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com